পলাশ ফুটেছে শিমুল ফুটেছে

খুব ভোরবেলায় কি এক অজানা কারনে আজ ঘুম ভেঙ্গে গেলো অপালার। এমন কাকডাকা শিশির ভেজা ভোরে অপালারতো ঘুম ভাঙ্গার কথা নয়। এমনিতে অপালার খুব ঘুম কাতুরে বলে নাম আছে বাড়ীতে, একবার বিছানা পেলে আর ছাড়তে চায় না অপালা। ভোরের ঘুমতো অপালার আরো প্রিয় তারমধ্যে শীতের সকালে বিছানার ওম ফেলে উঠে পড়া অপালার সাধ্যে নেই। বিছানায় শুয়েই অপালা শুনতে পেলো দিদুর কোরান তেলাওয়াৎ করার মিষ্টি মিহি সুর। পাখির গানের শব্দ, দুর থেকে ভেসে আসা ফুলের মিষ্টি ঘ্রান আর দিদুর তেলাওয়াতের সুর মিলে একটা নাম না জানা অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয় ভোরে অপালার বাড়ীতে। শুয়ে শুয়ে অপালা আড়মোরা ভাঙ্গছে আর এলোমেলো ভাবছে। দিদু খুবই পরহেজগার মানুষ তার উপর দাদু মারা যাওয়ার পর থেকেতো দিদু শুধু নামাজ কোরান নিয়েই থাকেন। তারপরও এই ফেব্রুয়ারী মাসে দিদুর কোরান পড়ার সুরটাতে যেনো অনেক বেশী বিষাদ মাখানো থাকে। নাকি অপালার মনের ভুল এটা ভাবতে ভাবতে পাশ ফিরলো অপালা। এমনিতে অপালারা সবাই সব সময়ই দিদুকে খুব সমীহ করে থাকে, বিশেষ করে দাদু মারা যাওয়ার পর থেকে তো দিদুর যত্নের যেনো কোন ত্রুটি না হয়, দিদু যেনো কোন ব্যাপারে মনে কোন কষ্ট না পান সেই দিকে বাড়ী সুদ্ধ সবাই সজাগ থাকে। কখনও যেনো দিদু একা না থাকেন, শত ব্যস্ততার মাঝেও সেদিকে লক্ষ্য রাখে বাড়ীর সবাই। দিদুর ঔষধ, খাবার সব আলাদা গুরুত্বের সাথে তদারক করা হয়। তারপরও ফেব্রুয়ারী মাস এলে বাড়ীটা যেনো আরও সর্তক থাকে, আরো বিষাদ মাখানো গম্ভীর চুপচাপ হয়ে যায়। দিদুর মুখে যেনো কষ্টের যন্ত্রণার অন্য একটা নীল ছাপ থাকে আর তাদের বাড়ী শুদ্ধ সবার চেষ্টা থাকে সেই ছাপটাকে যতদুর সম্ভব হালকা করে দাদুকে সহজ করে রাখা।

পলাশ ফুটানো শিমুল ফুটানোর এই ফাল্গুনে ঘটে গেছে বহু বছর আগে এক মর্মান্তিক ঘটনা যার রেশ এখনও রয়ে গেছে অপালাদের সারা বাড়ী জুড়ে, কিংবা হয়তো সারা দেশ জুড়ে। বহু বহু দিন আগে, অপালার বাবার ও জন্মের আগের সে ঘটনা। কিন্তু সব সময়ই যখন কোন দেশ কাপানো ঘটনা ঘটে তখনই কাকাদাদুর ঘটনাটা সব্বাই আবার আলোচনা করে বলে মনে হয় যেনো সেদিনকার ঘটনা। আর আমাদের দেশেতো দেশ কাপানো ঘটনা হরদম ঘটতেই থাকে, ভয়ঙ্কর সব ঘটনায় সারা দেশ কেপে উঠে শুধু জাতির বিবেক কেনো যেনো কাপে না। এ তখনকার কথা যখন ঢাকা এতো ব্যস্ত মহানগরী হয়ে ওঠে নি। এত্তবড় ঢাকা শহর তখন অনেক ফাকা ফাকা, এত্ত লোকজন নেই চারিদিকে, ছিল না এত্ত গাড়ী কিংবা এতো ফ্ল্যাটের চমক ধমক। তখন অপালার দাদু-দিদুর ছোট্ট সংসার, দাদু-দিদু আর বড় চাচ্চুকে নিয়ে। দাদু সারাদিন অফিস সেরে, ওভারটাইম করে বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত আটটা কি নটা, দিদুকে সারাদিন বাড়ীতে একা থাকতে হয় বড় চাচ্চুকে নিয়ে। খুব বেশী পরিচিত কেউ নেই দাদু-দিদুর ঢাকাতে,দিদুর খুব মন খারাপ থাকে তখন। দিদু একটু ভয়ও পায়, মাঝে মাঝেই নাকি বাড়ীর কাছে দিনে দুপুরে শেয়াল ডেকে উঠত। সেই সময় দাদুর সদ্য পাস দেয়া ভাই এলেন শহরে বড় ভাইয়ের কাছে থাকতে, পড়তে। দিদু কাকাদাদুকে পেয়ে যেনো আকাশের চাদ পেলেন হাতে। দিদুর কাছে অনেক গল্প শুনেছে অপালা। সাহেবদের মতো নাকি কাকুদাদুর গায়ের রং ছিল আর এই লম্বা সুঠাম স্বাস্থ্যর যুবক ছিলেন কাকুদাদু। অপালারা ভাইবোনরা দিদুকে অনেক ক্ষ্যাপাতো এই সাহেবদের মতো রঙ্গের উপমার জন্যে। আজও কেনো জানি রুপের সৌন্দর্যের উপমার জন্য সাহেবদেরকেই পরিমাপের একক হিসেবে দেখেন এদেশের অনেকেই। অথচ বৈষ্ণব কাব্যের রাধা থেকে শুরু করে বাসবদত্তার রুপের বর্ণনা এই ভাষাতেই হয়েছে। কোকড়া চুলের আর মায়াভরা চোখের কাকাদাদুও গান গেয়ে, আবৃত্তি করে হইচই এ বাড়ী সবসময় মাতিয়ে রাখতেন। কাকুদাদু আর দিদু সমবয়সী বলে বন্ধুত্বও ছিল বেশ দুজনের মধ্যে। সব কিছু ঠিক যাচ্ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে কাকুদাদুর বাড়ী ফিরতে দেরী হতে লাগল। কাকুদাদু আর দাদুর মধ্যে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে রাত রাত পর্যন্ত অনেক কথা হতো, দাদু খুব ভয় পেতেন, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে, শাসক শ্রেনীর মনোভাব নিয়ে তারচেয়ে বেশী ভয় ছিল তার প্রাণ প্রতিম ছোট ভাইকে নিয়ে। দিদু অতশত বুঝতে চাইতেন না, কাকুদাদুর ফিরতে দেরী হলে রাগ করতেন, কিন্তু কাকুদাদু হেসে বোঝাতেন, কি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তিনি। তিনি বললেন দিদুকে বাংলাদেশের সবার মায়ের ভাষা, সবার নাড়ীর ভাষা, দুঃখ-সুখ প্রকাশের সেই চিরপরিচিত ভাষা কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্রের কথা। শাসক সমাজ হঠাৎ করে চাপিয়ে দিলো যে সবাইকে এখন থেকে বাংলাতে নয়, উর্দুতে কথা বলতে হবে। মাতৃভাষার দাবী নিয়ে তাই আজ ছাত্র সমাজ মাঠে নেমেছে, প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে সারা দেশের মানুষ, মিছিল মিটিং প্রতিবাদ চলছে সারা দেশ জুড়ে আর তার কেন্দ্র হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় তথা ছাত্রসমাজ।

মায়ের ভাষা কেড়ে নেয়া, বিদেশী ভাষায় সবাইকে কথা বলতে হুকুম দেয়া, হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্রে উত্তাল তখন সারা দেশ। দাদু চাইছেন না কিছুতেই কাকুদাদু তখন বাড়ীর বাইরে বেশী বের হন, কখন কোথায় কি ঘটে সেই দুশ্চিন্তায় অস্থির থাকেন দাদু সারাক্ষন। সেদিনের কথা কি করে ভুলবে দিদু-দাদু বা অপালার বাড়ীর কেউ কখনও? সবার কাছ থেকে অজস্র বার শুনতে শুনতে অপালা যেনো সেদিনটিকে নিজের কল্পনার মানস চোখে স্পষ্ট দেখতে পায়। ঝকঝকে রৌদ্র উজ্জল সোনালী সকাল চারদিকে সোনাঝরা রোদ দিয়ে এ ধরনীকে আলোকজ্জল করে রেখেছে। রাস্তার চারপাশ লাল হয়ে আছে কৃষ্ণচুড়ার আভায় যেনো আগুন লেগেছে এ শহরে। একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় করে অফিসে গেলেন দাদু। দিদুকে বলে গেলেন কাকুদাদুকে গল্পের ছলে হোক আর যে করেই হোক যতটা বেশী সম্ভব ঘরে আটকে রাখতে, শহরের অবস্থা ভালো না, কখন কি হয়। কিন্তু দিদু তখন মহাব্যস্ত সদ্য জন্মানো মেজ চাচ্চুকে নিয়ে, তারসাথে নিত্যদিনের ঘরকন্নার রান্নাবান্না কাজকর্মতো আছেই। কোন ফাকে কাকুদাদু বেরিয়ে গেলেন দিদু খেয়াল করতে পারলেন না। সারাদিন কাকুদাদুর কোন খোজ নেই, দিদু অস্থির। দাদু ফিরলেন অফিস থেকে একরাশ টেনশন মাথায় নিয়ে , দাদু শুনে এসেছিলেন মিছিলে গুলী চলেছে, ছাত্র সহ বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়েছেন। বাড়ী ফিরে যখন শুনলেন কাকুদাদু সেই সক্কালে বেড়িয়েছে আর এখন অব্দি ফেরেননি তখন সাথে সাথে ছুটলেন আবার বাইরে, খোজ খোজ আর খোজ করে পেলেন প্রাণপ্রিয় ভাইয়ের মৃতদেহের খোজ। নিমেষে দাদুর পৃথিবী চুরচুর হয়ে ঝরে গেলো। আগুন ঝড়ানো রঙ্গের পলাশ-শিমুল সেই থেকে আজো নারীর খোপার পরিবর্তে ভাইদের গলার মালা হিসেবে শ্রদ্ধাঞ্জলী রুপে ব্যবহৃত হয়। সেই থেকে শুধু বসন্তের আগমন বার্তা নিয়ে আর ফাল্গুন আসে না, তার সাথে নিয়ে আসে ভাই হারানোর ব্যথার সমৃতিও।

দিদু হতবাক, সকালে যে তরতাজা হাসিখুশী উচ্ছল প্রাণটি ছটফট করে কথা বলল সে আর কোনদিনও কথা বলবে না একি ভাবা যায়? দিদু তার ছোট ভাইয়ের মতো বন্ধুসম সাথী হারিয়ে পাথর। দাদু নির্বাক কি জবাব দেবেন তার বাবা-মা কে? কিভাবে বলবেন মা তোমাকে ‘মা’ বলে ডাকবার দাবী নিয়ে মাঠে নামায় তোমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে হায়েনারা? শোকে সারা দেশ মুহ্যমান, পাথর। গর্জে উঠল সারা দেশ পাকিস্তানী শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মানি না, মানব না শ্লোগানে। সেই সব মিছিল, মিটিং, আলোচনা আর পোষ্টারে উত্তাল ঢাকাকে পাকিস্তানী শাসকরা রক্তাত করল গুলি দিয়ে, মারা গেলেন সালাম, রফিক, বরকত, কাকুদাদু সহ আরো অনেক নাম না জানা শিক্ষার্থী এবং সাধারণ লোক। কিন্তু আন্দোলন থামল না বন্দুকের ভয়ে, লিখা হোল অমর একুশে সঙ্গীত ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কে ভুলিতে পারি?’ আন্দোলনের মাধ্যমে ছিনিয়ে নিল বাংলার মানুষ তার জন্মের পরে প্রথম বোলের দাবী, মা বলার দাবী, মাতৃভাষা বাংলার দাবী। রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলো। সব আবার আগের মতোই সচল হলো, রাষ্ট্র ভাষাও বাংলা হলো কিন্তু শুধু আর অপালাদের বাড়ীটা আগের মতো হাসিগানে উচ্ছল হয়ে উঠল না কখনও। পাথর প্রতিমার মতো হয়ে গেলেন দিদু, নিজেকে দোষী ভাবতে লাগলেন অনেকটা কাকুদাদুর মৃত্যুর জন্য। হাজারোবার ভেবেছেন আর আক্ষেপ করেছেন দিদু যদি কাকুদাদুকে ঘরে ধরে রাখতেন সেদিন তবে হয়তো অকালে এভাবে দাদু ঝরে যেতেন না। অপালা জেনেছে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন হয়েছে এই পৃথিবীতে তাই একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দিয়েছে জাতিসংঘ। ইউনির্ভাসিটির পাশে মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে শহীদ মিনার, ছাত্রদের রক্ত দিয়ে লাল হওয়া জায়গায় বুক উচু করে দাড়িয়ে আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সজোর প্রতিবাদের প্রতীক। ইউনির্ভাসিটি ক্যাম্পাসের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অপালা যখন শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে যায় তখন দু;খের সাথে গর্বেও অপালার বুক ভরে ওঠে কাকুদাদুর কথা ভেবে।

সবাই বলে ভাষা আন্দোলন ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ, স্বাধীনতার প্রথম সুচনা। ভাষা আন্দোলনের সিড়ি বেয়েই অর্জিত হয়েছে আজকের স্বাধীনতা। একের পর এক পাকিস্তানী শাসকদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ, আন্দোলনের পথ বেয়ে শুরু হয় অভ্যুত্থান আর তারপর মুক্তিযুদ্ধ। সোনার বাংলাকে নাগিনীর পাশ থেকে মুক্ত করে নিজেদের করে নিল দামাল ছেলেরা। বাংলামাকে নিজের মতো করে গড়বে বলে ছিনিয়ে নিলো বন্ধুবেশী শত্রুদের কাছ থেকে। কিন্তু ভাবে অপালা এই কি সেই গর্ব ভরা অর্জন আমাদের যার গল্প দিনরাত শোনে অপালা দিদু, বাবা-মা, কাকু-ফুপু সবার কাছে? আজকে বাড়ির বাইরে বেরোতে হলে সব্বাই মানা করে অপালা একা যেও না, বাড়ী ফিরে না আসা পর্যন্ত সবাই ভাবতে থাকে ঠিকমতো ফিরে আসবেতো? দিদুর বা মায়ের বড় কোন অসুখ হলে সব্বাই ভাবতে থাকে দেশে সুচিকিৎসা হবেতো? নাকি পাশের দেশের শরন্নাপন্ন হতে হবে? আর দেশের চিকিৎসার ব্যয়ভার নিতে পারবেতো অপালার বাবা? দেশতো স্বাধীন হয়েই গেছে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে বিনিময়ে, শত্রুরাতো সব চলে গেছে তাহলে কেনো সারাক্ষন এভাবে ভয়ে ভয়ে বেচে থাকা? কাকে ভয়, কিসের ভয়? সন্ত্রাসের ভয়, চাদাবাজদের ভয়, পুলিশের ভয়, র‍্যাবের ভয়, জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে ভয়, অসুস্থ হলে সুচিকিৎসার ভয়, পাশ করলে চাকরী পাওয়া যাবে কিনা সেই ভয়। স্বাধীন দেশে কেন সর্বক্ষন সব্বাইকে এভাবে মরার মতো বেচে থাকতে হবে? এইবার এইচ এস সি পাশ করল অপালা যথেষ্ঠ ভালো রেজালট নিয়েই কিন্তু ভর্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। একটি মাত্র সরকারী ইউনিভার্সিটি ঢাকাতে আর তাতেও থাকে রেজালট আর মেধা ছাড়া অনেক ব্যকিং এর ব্যাপার, অপালার বাবা সাধারণ ছোট চাকুরী করেন তার পক্ষে মেয়েকে ব্যকিং দিয়ে ইউনির্ভাসিটিতে ভর্তি করানো সম্ভব নয় যেমন সম্ভব নয় এতো পয়সা দিয়ে প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়ানো। কি করবে অপালা? ভেবে ভেবে অপালা রাতে ঘুমাতে পারেনা, পাশবালিশটাকে জড়িয়ে ভাবছে এ কেমন স্বাধীনতা আনলো অপালার পুর্ব পুরুষরা যাতে কোন কিছুর নিশ্চয়তা নেই। জনসংখ্যা বেড়ে চলছে অবিরত কিন্তু তাদের জন্য নেই পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুযোগ, নেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, নেই স্বাধীনভাবে কথা বলার বা ভাবার সুযোগ। স্বাধীনতার মানে কি তাহলে মরে মরে বেচে থাকা নাকি আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া বেচে থাকার মৌলিক অধিকারগুলোর জন্যে? জানে না অপালা।

অপালা পরাধীন বাংলাদেশ কেমন ছিল জানে না, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বরুপও অপালা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা। অথচ প্রাকৃতিক সম্পদ, জনবল, মেধা কি নেই আমাদের? তারপরও কেনো আমরা ধীরে ধীরে এমন চুড়ান্ত পরিনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি? কি মুল্য দিচ্ছি আমরা আমাদের স্বাধীনতার? পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা পুর্ব পাকিস্তানের টাকায় পশ্চিম পাকিস্তানে মিল কারখানা গড়ছেন, তারা এই বাংলার জনগনের সাথে প্রতারনা করছেন তারা বাংলার জনগনের দিকে তাকাননি কিন্তু আজকের পরিস্থিতি কি সেই পরিস্থিতি থেকে খুব আলাদা কিছু? তখন পাকিস্তানী শাসকরা ভাবেন নি সাধারণ লোকজনের আশা আকাংখার কথা কিন্তু আজকেই কি দেশীয় শাসকরা ভাবছেন আলাদা করে কিছু? আজকেও স্বাধীন দেশে সংবাদ ছাপার উপর থাকে নিষেধাজ্ঞা, বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রন করে প্রশাসন, ছাত্র শিক্ষক অবিরাম রাজনীতির শিকার, নতুন নতুন ধরনের আইন রক্ষা বাহিনী তৈরী করা জনগণকে শায়েস্তা করার জন্য তাহলে স্বাধীনতা আর পরাধীনতার ফারাক কি এইটুকুই যে তখন বর্গী আসত খাজনা নিতে আর আজ আসে দেশীয় মুখ? রক্ত দিয়ে অর্জন করা মাতৃভাষা আজ চর্তুদিকে অবহেলিত, আজকাল বিত্তবান থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্ত সবাই ছুটছেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পিছনে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতকে নিরাপদ করতে। দেশের পড়াশোনার মান নিয়ে সংশয়, চাকুরীর অনিশ্চয়তা শিক্ষিত সমাজকে করে তুলেছে বিদেশমুখী। বাংলা এখন গরীবের ভাষা, যাদের সামর্থ্য নেই তারাই আজ বাধ্য মনে বাংলা ভাষা ব্যবহার করছেন। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাজনীতি ও পড়াশোনার মান সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোর ব্যবসায়ের। প্রাইভেট ইউনির্ভাসিটিতে পড়া তারপর ক্রেডিট ট্রানসফার করে বিদেশের ইউনির্ভাসিটিতে পড়তে যাওয়া এবং ভবিষ্যতে সেখানে কর্মজীবনের সুযোগ, অর্থের মাধ্যমে অর্জন করা সুনিশ্চিত জীবন। মাতৃভাষা, জন্মভুমি আজ কোথায় নয় অবহেলিত? বিদেশী সংস্কৃতির দাপটে হারিয়ে গেছে লালন, বাউল, নক্সী কাথার মাঠ, পালা গান, কবি গান, আবদুল আলীম আর আব্বাসউদ্দিন। নিজেদের ঐতিহ্য আজ তোলা আছে বিশেষ বিশেষ দিনগুলোর জন্য। পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন, বিজয় দিবস,

স্বাধীনতা দিবসে একবার করে সবাই নিজেরা নিজেদেরকে বাংগালী ভাবে এবং সেটা পোষাক, গানে, পান্তায় ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টাও করে। স্বাধীনতার অর্জন কি তাহলে এটুকুই? সেজে গুজে শহীদ মিনারে ফুল দেয়া আর বইমেলাতে একটু ঘোরাঘুরি এইই কি শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো? সমস্ত অর্জন আজ প্রথা সর্বস্ব হয়ে গেছে। টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান দেখানো, পত্রিকা গুলোর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, একটু ছুটির দিনের আমেজ নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো পরিবারের সাথে, একটু ভালোমন্দ খাওয়া এর মধ্যেই আটকে গেছে দিবেসের মাহাত্ম্য।

অপালাদের কি হবে যারা এই দেশের মুখ পানে চেয়ে আছে? যাদের পুর্বপুরুষরা তাদের রক্ত ঝরিয়ে গেছেন দেশ ও দশের স্বাধীন সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে? যারা আজো শত বাধা উপেক্ষা করে বাংলায় গান গায়? যারা আজো স্বাধীনতার অর্জন নিয়ে আশাবাদী, আজো বাঙ্গলাদেশকে কেন্দ্র করে অনেক স্বপ্ন দেখে, অনেক দুর হেটে যেতে চায় লাল সবুজের পতাকা নিয়ে। একুশকে যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্তম্ভ ভেবে পথ চলে তারা আর কতো নিপীড়ন সইবে? স্বাধীনতার অর্জন যাদের চেতনায় দৃপ্ত হয়ে বিদ্যমান, যারা নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত, নিজ দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির উপর যাদের গভীর আস্থা তারা কেনো আজ হতাশ? এতো অনিশ্চয়তা, হতাশার মাঝেও পলাশ ফোটানো শিমুল ফোটানো ফেব্রুয়ারীতে অপালারা আশায় বুক বাধে, শহীদ মিনারের পাদদেশে আল্পনা আকে, শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। গান গায়,

‘বাংলা আমার তৃষ্ণার জল, তৃপ্ত শেষ চুমুক
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি
দেখি বাংলার মুখ।’

ভেবে চলে অপালা শেষ বিন্দু পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবো পুর্বপুরুষদের এই অর্জন ধরে রাখতে, হারবো না কিছুতেই। বেলা অনেকটাই গড়িয়ে গেছে, সুর্য্যি মামা এখন আস্তে আস্তে মাথার উপর চড়ছেন, জানালা দিয়ে অনেকখানি আলো অপালার বিছানায় এসে পড়েছে আর শুয়ে থাকলে নির্ঘ্যাত মায়ের হাতে বকুনী বাধা একথা মনে পড়তেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল অপালা। শুরু হলো অপালার জন্য আরেকটি সংগ্রামী নতুন দিন অনেক আশা আর চেষ্টা নিয়ে।

সফল হোক অপালার চেষ্টা, সাফল্য পাক অপালারা এই শুভ কামনা জানাচ্ছি দেশ জুড়ে থাকা সমস্ত অপালাদের।

তানবীরা তালুকদার
২১।০২।০৬